অশ্বচরিত

[২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ]

অমর মিত্র

অশ্বচরিত
অমর মিত্র

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৬৫০ টাকা

Aswacharit by Amar Mitra Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Published: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 650 Taka RS: 650 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-9-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

'পুনঃ কুমারো বিনিবৃত্য ইত্যথো গবাক্ষমালাঃ প্রতিপেদিরেহঙ্গনাঃ।
বিবিক্ত পৃষ্ঠং চ নিশাম্য বাজিনং পুনর্গবাক্ষাণি পিধায় চুক্রুশুঃ ॥'

(অষ্টমসর্গ, চতুর্দশ শ্লোক : বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষ)

পুনরায় কুমার ফিরে এসেছেন, এই ভেবে নারীসকল সমস্ত গবাক্ষদ্বারে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে ফিরেছে দেখে তাঁরা গবাক্ষ রুদ্ধ করে আবার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

প্রিয় লেখক
অভিজিৎ সেনকে
স্বদেশের দিকে একই যাত্রায়

ভানুর সঙ্গে ঘোড়ার খোঁজে

১৯৮০ নাগাদ, তখন তিরিশে পৌঁছইনি, একটি নভেলেট লিখেছিলাম শিলাদিত্য পত্রিকায়। সম্পাদক ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। 'বিভ্রম' ছিল সেই নভেলেটের নাম। একটি ঘোড়ার গল্প। দীঘার সমুদ্রতীরের এক হোটেলওয়ালার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি প্রতি আশ্বিনে পালায়। সুবর্ণরেখা এবং সমুদ্রের মোহনার কাছে বড় একটি চর ছিল। আশ্বিনে সেই চরে চারদিক থেকে ঘোটক ঘোটকীরা পালিয়ে আসে সবুজ ঘাস এবং প্রেমের নেশায়। ঘোড়া এবং ঘুড়ীদের ভেতর ভালোবাসা হয় সেই সময়। কিন্তু সেই বছর বৈশাখে সে অদৃশ্য হয়েছিল। নিখোঁজ সেই ঘোড়া খুঁজতে যায় হোটেলওয়ালার আশ্রিত ভানু দাস। মধ্যবয়সী ভানু ছিল হা-ঘরে। দুনিয়ায় কেউ কোথাও ছিল না তার। আমি দীঘায় গিয়েছিলাম শীতের সময়। ডিসেম্বর মাস। একটি হোটেলে মাস-চুক্তিতে আমি ঘর ভাড়া করেছিলাম। সেই হোটেলের মালিকেরই ছিল ঘোড়াটি। দেখতাম আমার ঘরের জানালার ওপারে নিঝুম বেলায়, নিঝুম রাতে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভানু কোথায় যেত ঘোড়াটির খোঁজে তা জানা যেত না। রাহা খরচ নিত গাঁজাড়ু হোটেলওয়ালার কাছ থেকে। মনে হয় ঘোড়া খোঁজার নাম করে সে নিজের একটা আয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ভানু আশ্চর্য সব জায়গার নাম করত হঠাৎ হঠাৎ। মীরগোদার জাহাজ ঘাটার দিকে দেখা গেছে নাকি একটি ঘোড়া। রানিসাই গ্রামের একজন খবর দিয়েছে সেদিকে একটি ঘোড়া দেখা গেছে। যাই হোক ভানুর সঙ্গে আমিও ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে নুনের খালারি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু যে কথা বলতে চাইছি, আশ্বিনে যার পলায়নের কথা সে বৈশাখে কেন পালিয়েছে? গেল কোথায় সেই বুড়ো টাট্টু? ভানু জানে না। লেখক জানবে কী করে?

বাস্তবতা ছিল ঘোড়াটি নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু কেন তা কেউ বলতে পারছে না।

জীবনের অনেক রহস্য খুঁজে বের করা যায় না সত্য। অনেকেই তা প্রকাশ করেন না। লেখক তো তৃতীয় নয়নের অধিকারী, তিনি সেই রহস্য কি উন্মোচন করতে পারবেন না। আমি ভানুকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তার অশ্ব কেন নিরুদ্দেশে গেল। হোটেলের ঠাকুর বলল, কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে। সোজা কথা। এতে করে নিরুদ্দেশের রহস্য শেষ হলো। কিন্তু

ভানু দাস আমাকে বলেছিল, না দাদা, বুড়ো ঘোড়াকে কে চুরি করবে? তাহলে সে পালাল কেন, এখন তো আশ্বিন নয়?

ভানু উত্তর দিতে পারেনি। পরের ডিসেম্বরে আমি চলে আসি দীঘা থেকে। তখনও রাহা খরচা নিয়ে ভানু সেই পলাতককে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বদলি হয়ে চলে আসার পর আমার ভিতরে প্রশ্নটি ছিল, সে পালিয়েছিল কেন বৈশাখে? আশ্বিনের বদলে বৈশাখে কেন? উত্তর নেই। আমি উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম নিজের ভিতরে। নভেলেট লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে। সেই সময়েই যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো এক ভোরে আমি লিখতে বসে পেয়ে গিয়েছিলাম পলায়নরহস্য। সে ছিল যেন প্রকৃতি এবং জীবনের রহস্য উদ্ধার।

সেদিন ছিল ভয়ানক বৈশাখ। ঘোড়ায় চেপে ঘোড়ার মালিক ফিরেছিলেন তাঁর গ্রাম থেকে দীঘায়। রোদে ঘোড়াটির জিভ বেরিয়ে এসেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল একটি নিম গাছের ছায়ায়। নবীন তরুর ছায়া ছিল না বেশি। ফলে বৈশাখের রোদে পুড়ছিল। গরম বাতাস বইছিল। বালিয়াড়ি তেতে গিয়েছিল ভীষণ। ঘোড়াটি ধুঁকছিল। এরপর দুপুরের শেষে আকাশের ঈশেন কোণে মেঘের সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে সমস্ত আকাশ। সমুদ্র দিগন্ত থেকে মেঘ উঠে আসতে থাকে ওপরে। ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে। ঝড় এলো। তারপরই বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণে ভেসে যায় সব। উত্তাপ অন্তর্হিত হলো। বৃষ্টি থামে ঘণ্টা দেড়ের পর। সন্ধে হয়ে আসে। সবদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঘোড়াটি বৃষ্টিতে ভিজেছে কত। ঠাণ্ডা হয়েছে শরীর। আরাম হয়েছে তার। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধের পর চাঁদ উঠল। আশপাশের বালিয়াড়ির ধারের গর্তে, রাস্তার কোথাও কোথাও জল জমেছিল। রাত হলে চাঁদ আকাশের মাথায় উঠে এলে জোছনা পড়ল জমা জলে। আকাশে দেখা গেল পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে। ঘোড়াটি অবাক হয়ে আকাশ মাটি দেখল। বাতাসে ঘ্রাণ নিল। তার মনে হলো আশ্বিন—শরৎকাল এসে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিল ভয়ানক গ্রীষ্ম। দুপুরের শেষে এলো বর্ষা। তারপর আশ্বিনের পূর্ণিমা। শরৎকাল। একই দিনে দুই ঋতু পার করে আশ্বিনে এসে গেছে সে। সুতরাং চলো নিরুদ্দেশে। সেই যে সুবর্ণরেখার মোহনায় চর জেগেছে সবুজ ঘাস নিয়ে, সেখানে এসে গেছে ওড়িশার ভোগরাইয়ের ঘুড়ী, আগের বছর তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তার। মিলন হয়েছিল। সে খুটো উপড়ে পালাল এই বিভ্রমে। সারারাত ছুটেছিল সে জোছনার ভেতর দিয়ে। সকাল হতে ফিরে এলো বৈশাখ। রোদ তেতে উঠতে লাগল। সে টের পেল আর ফেরার উপায় নেই। ভয়াবহ গ্রীষ্ম ফিরে এসেছে। বিভ্রম হয়েছিল। বিভ্রমে সে সমস্ত রাত ধরে মৃত্যুর দিকে ছুটেছে। *অশ্বচরিত* উপন্যাসের খসড়া ছিল এই। ১৯৮১'র ফেব্রুয়ারিতে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় ছাপা হয় *বিভ্রম* নামের যে নভেলেট, তা হয়ে গেল *অশ্বচরিত*।

বিভ্রম নভেলেট প্রকাশিত হলে অনেকের ভালো লেগেছিল। অচেনা লেখকের লেখা ছেপেছিলেন সুধীরবাবু পাণ্ডুলিপি পড়ে। আমার তখন একটি দুটি বই বের হচ্ছে প্রকাশকের ঘর থেকে। কিন্তু *বিভ্রম* নিয়ে আমার ভেতরে দ্বিধা ছিল। মনে হতো আরও কিছু লেখার আছে। আমি লিখতে পারিনি। বছর সাত বাদে ১৯৮৮ নাগাদ আমি আবার লিখতে আরম্ভ করি উপন্যাসটিকে। সামনে সেই নভেলেট। লিখেছিলাম। এক প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলাম প্রকাশের জন্য। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য, তিনি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মনে হয়েছিল *বিভ্রম* আর বই হয়ে বের হবে না। আমি আরও নভেলেট লিখেছি এই সময়ে, *আসনবনি* নামের নভেলেট তো গল্পের বইয়ে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু *বিভ্রম* আমার মাথার ভেতরে একটি কাঁকর ফেলে দিয়েছিল। গল্পের বইয়ে রাখিনি। আরও লিখতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না নভেলেটটি নিয়ে। পড়েই থাকল আরও দশ বছর। ১৯৯৭-এ রাজস্থানের মরুতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর আমি আবার নভেলেটটিকে সামনে রেখে নতুন উপন্যাস লিখতে শুরু করি। বিস্ফোরণের দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। আমার ঘোড়াটি পালিয়েছিল সেই দিনই। আমি তা ১৯৮১ সালেই লিখেছিলাম। এই ১৭ বছরের মাথায় সেই বুদ্ধ-পূর্ণিমাই হয়ে গেল পথ। রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব কন্থক হয়ে গেল সেই বুড়ো টাট্টু। ভানু হয়ে গেল গৌতমের সারথি ছন্দক। তারা তপোবনে দিয়ে এসেছিল রাজপুত্রকে। তিনি ফিরবেন এই হিংসার পৃথিবীতে। ভগবান বুদ্ধ ফিরবেন। সারথি ছন্দক আর অশ্ব কন্থক অপেক্ষা করছে তার জন্য এই সময়ে। সময় ১৯৯৮। রাজপুত্র ফিরে এলে পৃথিবী হিংসামুক্ত হবে। পলাতক ঘোড়া বিভ্রমে পড়েছিল। বিভ্রম তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে সে হিরোশিমায় গিয়ে পড়ে। সেখানে তখন কালো বৃষ্টি।

অশ্বচরিত লিখতে ১৭ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। লেখক নিজেই বোঝেন লেখা হয়েছে কি হয়নি। তিনি নিজেই নিজের পাঠক। নিজের জন্যই প্রথমে লেখেন। *অশ্বচরিত*'র পর নিরুদ্দেশ যাত্রাই হয়ে ওঠে আমার বিষয়। শেষ হয়নি সেই লেখা। ধ্রুবপুত্র এক নিরুদ্দিষ্ট কবির কথা। কবি নিরুদ্দেশ হলে মেঘও অন্তর্হিত হয় নগর থেকে। এরপর নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান লিখি এক নিরুদ্দিষ্ট জুটমিল শ্রমিককে নিয়ে। ধনপতির চর নিয়েই নিরুদ্দেশ যাত্রা করে চরবাসী। সোনাই ছিল নদীর নাম এক নিরুদ্দিষ্ট নদীর কথা। আর ২০১৬ সালে লেখা *পুনরুত্থান* উপন্যাসেও নিরপরাধ পুলিশকর্মী নিরুদ্দেশে যায় নিজেকে বাঁচাতে এবং ফিরেও আসতে চায় লকআপে হত মানুষটির পুনরুত্থান ঘটিয়ে। মর্গ থেকে বেরিয়ে আসে মৃত। চাপা পড়া খনি থেকে উঠে আসে নিরুদ্দিষ্ট মানুষ। একটি উপন্যাসই যেন শেষ হচ্ছে না। বারবার লিখতে হচ্ছে নিরুদ্দিষ্টের কাহিনি নানা রকমে। কোনো কাহিনিই আগের কাহিনির

পুনরাবৃত্তি নয়। কিন্তু কোথায় যেন একই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বয়ান। আসলে আমাদের জীবন এমন যে ফেলে আসা সময় আর ফেরে না। নিরুদ্দেশে যায় সব। শেষে ব্যক্তি মানুষই সব ফেলে রেখে যায় নিরুদ্দেশে। এ জীবনের অন্তিম গন্তব্য তো তাই।

পুনশ্চ : পশ্চিম আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ১৫০ মাইল দূরে যশুয়া বৃক্ষ ন্যাশানাল পার্ক। মরু অঞ্চল। সব নেড়া পাহাড় আর মধ্যম উচ্চতার যশুয়া বৃক্ষ। নিঝুম জনবিরল অঞ্চল। সেখানে একটি উপত্যকার নাম 'লস্ট হর্স ভ্যালি' আর রাস্তার নাম লস্ট হর্স রোড। ভানুর ঘোড়া প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে কি সেই মরু অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল হিরোশিমা পার হয়ে? প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারেই তো ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস আর যশুয়া বৃক্ষের মরু-পাহাড়ের অঞ্চল। সেই মহাসাগরের একদিকে জাপান, হিরোশিমা, অন্যদিকে যশুয়া বৃক্ষের মরুদেশ।

অমর মিত্র
২৪.১১.২০২২

ভানুচরণ মানুষটি বড় অদ্ভুত। আসতে আসতে কী মনে হলো ভেড়িবাঁধ থেকে নেমে ঝাউবনের দিকে চলে গেল, যেন ঝাউবনে তার কন্থক রয়েছে। ছিল পক্ষিরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানু দাস হয়ে গেল ছন্দক। ঘোড়া হারিয়ে সে আরও উদাস হয়ে গেছে। না হলে ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরিয়ে আপন মনে অন্য দিকে চলে যায়! বলে কিনা, ওই দিকে যাই, আপনি বাবু দেখে আসুন লায়কানখাস। সেই থেকে শ্রীপতি একা। একেবারে একা।

ভেড়িবাঁধের বাঁদিকে ঝাউবন। ঝাউবনের ওপারে সিংহসমুদ্র। হাজার সিংহ এক সঙ্গে গজরাচ্ছে। সিংহর কথা বলেছিল কে? ফরাসি সায়েব ফ্রেদরিক। লায়ন লায়ন! শ্রীপতিরও তাই মনে হয়। সিংহই বটে। তবে গর্জন যখন থাকে না, শুধু ঢেউ ভাঙে অন্ধকারে, পারের কাছে সফেন সমুদ্র বারবার মাথা কোটে, তখন মনে হয় সিংহ নয়, ও তার কেশর ফোলানো সাদা পক্ষিরাজ। পালাতে গিয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। বারবার মাথা তুলছে নোনা জলের বিপুলতা থেকে। ঘোড়াটা কাঁদছে।

হ্যাঁ, এই স্বপ্ন দেখেছে শ্রীপতি কদিন আগে। ইদানীং কত রকম স্বপ্ন যে দেখে হারানো ঘোড়া নিয়ে! ভারতীকে নিয়ে। তার বউ মধুমিতা আর ভারতীকে নিয়ে। আবার ওই পক্ষিরাজকে নিয়ে। সব দুঃস্বপ্ন। দেখতে দেখতে গলা শুকিয়ে আসে। মনে হয় নোনাজলে ডুবে যাচ্ছে সে। নোনাজলের নীলে শুধু তার পক্ষিরাজের কেশর দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র কাঁদছে সারারাত।

শ্রীপতি ঘাড় ঘুরোয়। রাতভর যে সমুদ্রের কান্না শোনা যায়, সেই সমুদ্র আর এই নীল জলধি এক নয়। মাটিতে আছড়ে মাটি যেন খেয়ে ফেলতে চাইছে বঙ্গোপসাগর। ভেড়িবাঁধের দক্ষিণ দিকে অনেক নিচুতে ধানী জমি, মাঠ। মাঠ আর মাঠ, তারপর এগিয়ে গাছ-গাছালির ছায়া। নুনমারাদের গ্রাম। নুনের খালারিগুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে শ্রীপতি। এখন বিকেল, রোদ পড়ে গেছে। আর একটা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শ্রীপতি দেখছে তাকে ঘিরে ছায়া নামার আয়োজন।

ভানু কোথায় গেল কে জানে? ঘোড়া খুঁজেই বেড়াচ্ছে। খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। তবু যাচ্ছে। ঘোড়াটা যেন ভানুর। ভানুই ওই ঘোড়ার মালিক, এমনই তার উদ্বেগ। মনে পড়ে শ্রীপতির, লোকটা যেদিন কাজ নিল তার হোটেলে, মানে তার পোষ্য হলো, তার আশ্রিত হলো, ঘোড়া দেখে বলল, ঘোড়ার কাজ কত কাল ধরে করে, ঘোড়া চেনে সে নিজেকে চেনার মতো করে, শুনুন বাবু, আমি যদি হই ছন্দক, ও হলো কান্‌হা, কন্থক।

তারা কারা? শ্রীপতি অবাক হয়েছিল।

মনে নেই বাবু, কে রাজপুত্রকে পৌঁছে দিল তপোবন ধারে? রাজপুত্র সাধু হয়ে গেল রাজপুত্র হলো ভগবান বুদ্ধ, তার ঘোড়া আর সারথি মাথা হেঁট করে ফিরল, সেই ঘোড়া হলো আপনার ঘোড়া।

হলে ক্ষতি কী শ্রীপতির? তবে কিনা পক্ষিরাজটি বোঝা যায়, কন্থক নাম শুনে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এ কেমন নাম? আর ভানু দাস সে কখন কী বলে, সংস্কৃত ভাষা বলে, ভুগোল বলে, ইতিহাস বলে, বলে কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের কথা! তার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, কতটা বানানো তা কে ধরবে?

গায়ের ঘাম শুকোনোর মুখে। দক্ষিণের নোনা বাতাস হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ছে শ্রীপতির গায়ে। আজ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ মাসটিও শেষ হতে গেল প্রায়। আকাশে মেঘ আসছে আর যাচ্ছে। রোদের তাত কমছে না। জ্যোৎস্নাও যেন গরম হয়ে উঠেছে, প্রকৃতি এমনই। এখন মেঘের ভিতরে চাঁদ এবং সমুদ্র একসঙ্গে জেগে উঠেছে উন্মাদের মতো। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন টাল খাচ্ছে চাঁদও। ঠিক একটি মাস ভানুচরণের কন্থক—শ্রীপতির ঘোড়া পক্ষিরাজ নিরুদ্দেশ। এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। তার হোটেল থেকে বোশেখী পূর্ণিমার রাতেই পালিয়ে গেছে ঘোড়াটা। সেই ঘোড়া খুঁজতে সে দুপুর দুপুর বেরিয়েছিল লায়কানখাসের দিকে। সেখানে নাকি একটা ঘোড়াকে চরতে দেখা গেছে গত পরশু। দেখেছিল অনন্ত সার। সে ওই লায়কানখাসে নুনের খালারি করেছে। সেখানে তার বউ মেয়ে সারাদিন খাটে। অনন্ত লবণ নিয়ে আসে দীঘায়। এখানে পাইকার থাকে, কিনে নেয়। দরকারে সেও কাগজ পেতে বসে পড়ে। মোটা দানা লালচে নুন বেড়াতে আসা ট্যুরিস্টদের জন্য নয়। আশপাশের গাঁয়ের গরিব লোক এসে কিনে নিয়ে যায়।

অনন্ত সার দেখেছিল লায়কানখাসে একটি ঘোড়া চরছে। দেখেইছিল শুধু, এর বেশি কিছু নয়। ঘোড়ায় তার কোনো কৌতূহল নেই। ঘোড়া থাকে তাদের যারা ঘোড়ায় চাপতে পারে। বড় মানুষের বাহন ওটি। কিন্তু তাকে তখন জিজ্ঞেস করছিল ঘোড়ার রক্ষক ভানু, সে অবাক। ঘোড়া তো দেখেছে লায়কানখাসে।

দেখেছ, সত্যি দেখেছ, বাবুর অশ্ব, আমার কান্‌হা? ভানু প্রায় উদ্বাহু হয়ে ছুটে এসেছিল শ্রীপতির কাছে, পাওয়া গেল, ঘোড়া আছে।

গেল পাওয়া? শ্রীপতি তখন হোটেলের ঠাকুরের কাছে খোঁজ নিচ্ছিল তার বউ মধুমিতা এসে কোনো খোঁজ নিয়ে গেছে কি না ঠাকুরের কাছে। নার্স ভারতী চৌধুরী নিয়ে কতটা, কীরকম খোঁজখবর করেছে, আর কী জবাব দিয়েছে ঠাকুর। ভানুর কথা শুনে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল তাকে, উত্তেজনায় দপদপ করছে ভানুর সর্ব অঙ্গ।

আজ্ঞে লায়কানখাসে নাকি একটা ঘোড়া...। ভানু কথা শেষ করেনি।

কোন ঘোড়া, আমার পক্ষিরাজ?

আজ্ঞে ঘোড়া একটা, কন্থক হতে পারে, নাও হতে পারে।

ফের কন্থক, ওটি আমার পক্ষিরাজ।

আপনার নাম আপনার থাকুক, আসলে তো অন্য ব্যাপার, শুনুন বাবু, খবরটা দিল নুনমারা অনন্ত, একটা ঘোড়া চরতে দেখেছে সে লায়কানখাসে।

ডাক অনন্তকে।

আজ্ঞে, সে আর কোথায়, বলে চলে গেছে, ঘোড়াটা নিয়ে আসুন আপনি।

তুমি যাবে না ছন্দকমশায়?

আমি! আমি তো অন্য দিকে যাব, সব দিকে তো খোঁজ করতে হবে।

যদি লায়কানখাসে মেলে তো অন্য দিকে যাবে কেন?

তা ঠিক। ভানু মাথা চুলকেছে, যদি না হয় বাবু, সে তো কতদিন রয়েছে আমার সঙ্গে, পালিয়ে এত কাছে কি থাকবে?

তাহলে আমি যাব না?

তা কেন, খবর যখন মিলেছে, যেতে আপনাকে হবেই।

খবর দিয়ে ভানু চলে গিয়েছিল। ঠাকুর আটকেছিল শ্রীপতিকে, বিশ্রাম নিয়ে যান বাবু, ঘোড়া যদি থাকে, ঠিক পাবেন, ভালো ঘাস পেলে ওরা নড়ে না, কিন্তু লায়কানখাসে কি ভালো ঘাস হয়, ও তো বালি জমি, ওখানে ঘোড়া যাবে কেন?

তাহলে যাব না? শ্রীপতি দ্বিধায় পড়েছিল।

না আজ্ঞে, যেতে তো হবেই। খবর যখন এয়েচে, ঘোড়া বলে কথা, ঘোড়া হারালে মানুষের যে কী হয়, তা যার হয় সে জানে।

একটু বাদে বেরিয়েছিল শ্রীপতি। বেরিয়ে পুরনো কাফেটোরিয়ার কাছে ভানুর সঙ্গে দেখা। ছুটে এসেছিল সে, বাবু আমি কি যাব, যাই কিছুটা, আপনাকে এগিয়ে দিই, হ্যাঁ, অনন্ত সার বলল একখান অশ্ব দেখেছিল লায়কানখাসের বালির ওধারে যে চরজমি ঘাসের, সেখানে, ঘাস খাচ্ছে, আমার অবশ্য কেমন লাগল শুনে।

কী রং সে ঘোড়ার?

ভানু থমকায়, তারপর বলেছে, আজ্ঞে ওই কথাই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম অনন্ত সারকে, ঠিক আপনি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এক্কেবারে এক কথা।

তা বলল কী সে?

কী বলল? ভানু মাথা চুলকোচ্ছিল, সাদা না কালো, কালো না বাদামি! কোনটা? আজ্ঞে বাবু, সে তো ঘোড়া দেখেছে রং দ্যাখেনি—সে আমাদের কন্থক কি হবে?

রং দেখেনি অনন্ত সার। তখন তার লবণ ঝেঁটিয়ে তোলার সময়। সারাদিন যে জল শুকিয়েছিল রোদ্দুরের তাপে, তা থেকে যে মোটা মোটা স্ফটিক দানা বেরিয়ে আসে, তা ঝেঁটিয়ে বস্তায় ভরছিল সে। বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সূর্য ওই সময় কোনাকুনি পশ্চিমে তালসারির দিকে, ওড়িশার উপকূলে নেমে যায়। দূরে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যে ঝাউবন চলে গেছে পশ্চিমে তার ভেতর টুপ করে পড়ে গেছে রক্তবলয়। ছায়ায় ছায়ায় অনন্ত, তার বউ আর মেয়ে দেখল একটি ঘোড়া যেন

ঘাসের চরে দাঁড়িয়ে দুলছে। বেলা পড়ে এলে অতবড় মরুভূমির মতো বালুচর কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে আসে। চোখে ধন্ধ লাগায়। আর তাই-ই বোধহয় লেগেছিল। তারপর তারা লায়কানখাস ছেড়ে অলঙ্কারপুরের দিকে যখন এগোচ্ছে, তখনও আর একবার দেখা গেল ঘোড়াটাকে, অনন্তর কচি মেয়েটা আপনমনে বলে উঠেছিল, হা, দিখ অশ্ব।

হ্যাঁ, তারা সকলে দেখেছে ঘাসের জমি ছেড়ে ঘোড়াটা বালির ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ করে চেয়েছিল সমুদ্রের দিকে। এতটা পর্যন্ত ঠিক বলে গেল অনন্ত একটু আগে লায়কানখাসে দাঁড়িয়ে। তারপর সব শূন্য। সব দেখেছে তবু রং দেখেনি। দেখার হলে বলত ঠিক। রংটাই বাদ গেছে বোধহয়। যদি জানত এতে শ্রীপতিবাবুর উপকার হবে তাহলে রংটা মনে রাখত ঠিক। একেবারে সামনে গিয়ে পরখ করে রাখত রংখানি। কী ভুলই যে করেছে। শ্রীপতিবাবু যে ইনামও ঘোষণা করে রেখেছে তাও কি জানত তারা? আজই অনন্ত সারকে বলেছে ভানু।

আশ্চর্য ব্যাপার! জগতে কত বিস্ময়ই না আছে! দুপুরে কিছু সময়ের জন্য কী রোদ্দুর না ছিল! এই সব মেঘ তখন সমুদ্রে গা ডুবিয়ে ছিল বোধহয়। রোদে লায়কানখাস—বালির চর একেবারে মরুভূমি। মরুভূমির ওপারে যে ঝাউজঙ্গল, তার গায়েই ঘাসের জমি। কিন্তু সেই অঞ্চলে নুনমারারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শ্রীপতি গিয়ে লায়কানখাসে দাঁড়াতেই সমুদ্রে ডোবা মেঘ আবার আকাশে। ছায়া ঘনাইল বনে বনে।

শ্রীপতি বলল, কী রোদ!

নুনমারা অনন্ত সার বলল, রোদ কোথায় বাবু, সকাল থেকে মেঘলা, নুন শুকোচ্ছে না।

আর সব খালারির লোক কোথায়?

এই মেঘে কাজ হয় বাবু! সব এখন অন্য কাজে লেগে গেছে। এই দেখুন না, একটুও জল শুকোয়নি। বলতে বলতে পলিথিনের সিট, কলসি, বস্তা, কোদাল গুছিয়ে নিচ্ছিল অনন্ত সার, বিড়বিড় করছিল, বছরের মতো নুনের কাজ শেষ।

ঘোড়ার খোঁজ পেল না শ্রীপতি। অনন্ত সারের মেয়েটা বলল সেও দেখেছে। এই তো পরশু দিন। সেদিন খুব চড়া রোদ্দুর হয়েছিল, নুনও বেরিয়েছিল অনেকটা। হ্যাঁ অশ্বই বটে! কিন্তু রং! তা তো দেখেনি।

শ্রীপতি বলল, ঘোড়াটা দেখলি আর রং দেখিসনি! এ কীরকম হলো! তাহলে কী দেখলি?

তার কথা শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকে মেয়েটা। বয়স কত হবে! বছর পনেরো। সারাদিন রোদ্দুরে নুন মেরেও চোখমুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। কেমন ফুটফুটে ভাব। মুখে সর্বক্ষণ হাসি। বরং অনন্ত আর তার বউটা যেন নুয়ে পড়েছে। তাদের চোখমুখে রাজ্যের ক্লান্তি আর বিরক্তি। তারা বারবার আকাশের মেঘ দেখছিল।

অনন্তর মেয়ে বলল, কেনে অশ্বই তো দিখলাম।

রং ছাড়া কি বস্তু হয়! রং না থাকলে দেখবি কী?

আসলে শ্রীপতি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। ওরা দেখেছে সন্ধেয়। তাও অন্যমনস্ক ছিল। খেয়াল করেনি কী রঙের। এখন এদের কাছ থেকে আর কিছু জানা যাবে না।

অনন্ত সারের মেয়েটা অল্প বয়সী। গায়ের রংও ফরসা। চোখমুখে শ্রী আছে। আর সময়টা তো জোয়ারের। ভরা কোটাল। ফুলে ফেঁপে উঠেছে মেয়েটা। একেই বলে যৌবনের দীপ্তি। সেই দীপ্তি নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে মেয়েটা। দাঁতে আঁচলের খুট চেপে ধরে বলে, কী জানি বাবা ত্যাখন মনে হয়নি তাই রং দেখিনি, কী ধলা কী কালা!

এখন নুনমারাদের দিন শেষ। গত ছটা মাস শুকিয়ে শুকিয়ে জলবিন্দু লালচে শাদা স্ফটিকের দানা হয়ে গেছে। এই ছটা মাসে ঐ লবণের গলে জল হয়ে যাওয়ার সময়। অনন্ত সার বিরক্ত। আসলে দিনের পরিশ্রমটা মাঠে মারা গেছে। তাই এখন কিছু ভালো লাগে না।

শ্রীপতি আশা নিয়ে গিয়েছিল বোধহয় খোঁজ পাবে অশ্বের। কিন্তু পরশু বিকেলের পর তাকে আর কেউ দেখেনি। ফেরার সময় এখন তাই মেজাজটা ভালো নেই। অনন্ত সারের ফুটফুটে মেয়ে কুন্তির হাসি বেজে উঠছে চারপাশে। মন খারাপের ভিতর মেয়েটার কথাই ভালো। সমুদ্রের লোনা হাওয়া, তার ভিতরে সেই কথা, অশ্বর বন্ন দেখার কী আছে, অশ্ব অশ্বই, হাঁ বন্ন ছিলনি।

বর্ণ ছিল না মানে, বর্ণ ছাড়া কিছু বোঝা যায়?

শ্রীপতির কথায় মেয়েটা থমকেছে, তারপর জবাব দিয়েছে, কেনে ই বাতাস। ইর বন্ন কী, অথচ বুঝছোনি বাতাস আছে।

তাহলে ঘোড়াটা কি তখন বাতাসের দেহ নিয়ে ঘুরছিল লায়কানি চরে? বাতাসের দেহ পেলে জীবের জোর বাড়ে। হুড়মুড়িয়ে তছনছ করে দিতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই বাতাসের দেহ নিয়ে বর্ণহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার পক্ষিরাজ। ভাবতেই শ্রীপতির মুখে যেন আবছা-হাসি ফোটে।

অনেকটা চলে এসেছে। বামে ঠিক নিচেই বড় খালটার একটা মুখ। সেখানে অকেজো লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। মস্ত উঁচু ভেড়িবাঁধে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীপতি দেখল সাঁই সাঁই করে বেলা মরে গিয়ে অন্ধকার নামছে। তার আবার মনে হলো, বর্ণহীন ঘোড়া...।

বর্ণহীন ঘোড়া কেমন দেখতে? কী তার রং! গায়ের রং, মাথার রং, কপালের রং, পুচ্ছের রং! লেজটা কি সাদায় বাদামিতে মেশানো? পুরো দেহটা কি সাদা ধবধবে দুধের রঙে ভরা? নাকি পেটের দুপাশের পাঁজরের হাড় বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সাদা রংটা কালচে মেরে গেছে। পোড়া পোড়া লোমে যেন পুরো দেহটা আচ্ছাদিত। কপালের ওপর সাদা আর বাদামিতে মেশানো রং। তিনটে টিপ। চোখটা নীল আর কালোয় ভাসা। মানে ঠিক সমুদ্দুর থেকে তুলে আনা খাবলা রং।

জিভটার রং ফ্যাকাশে রক্তহীন লাল। ঘোড়াটা সন্ধেবেলায় যখন বেলাভূমি থেকে উঠে আসে, তখন শক্ত বাঁধানো পাড়ে, পিচ আঁটা রাস্তায় গম্ভীর শব্দ ওঠে ঠকঠক-ঠকঠক। ডুপ ডুপ ডুপ ডুপ...।

বিকেলে বেলাভূমিতে যখন ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ওর সাদা গায়ে পশ্চিম দেশের রোদ পড়লে সেই সাদা রঙের একটু পরিবর্তন হয় নিশ্চয়ই। ঘোড়ার পিঠে যে ঝালর, তার রং লাল। লাল সাটিনের কিনারায় কিনারায় থাকবে জরির কাজ। ঘোড়ার পিঠে যে উঠে বসবে সে নিশ্চয়ই খুব ফুটফুটে একটা বাচ্চা। নীল সমুদ্র, সাজানো পক্ষিরাজ! কেমন দেখায়? সমুদ্র হলো পক্ষিরাজের চালচিত্র।

পরশু সমুদ্রের বদলে ছিল লায়কানখাস। মানে ধু ধু বালির তরঙ্গে ঢাকা পৃথিবীর মাটি। আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় বালির দিকে তাকালে। আর রাতেও সেই বালি সাদা দেখায়। দূরে সমুদ্রের গর্জন থাকে, চেহারা দেখা যায় না। ঝাউ আর ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের আড়ালে কেশর ফুলিয়ে গর্জন করছে লায়কান দেবীর শিকল ছাড়া সিংহের দল। ঘোড়া শুধু ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনছে। সমুদ্রের বদলে আবছা সাদা মরুভূমির ভিতর দাঁড়িয়ে।

অনন্ত সারের মেয়েটা বলেছে ঘোড়ার রং ছিল না। তাহলে! সমুদ্র বেলাভূমি, অন্ধকার ঝাউবন, ঘুমে ভরা পৃথিবী-এর কত রং! তার ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পক্ষিরাজ। রঙে আরও প্রলেপ পড়ল। বর্ণহীন অশ্বের এত বর্ণ! শ্রীপতি সেই ভেড়িবাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে।

টুপ করে অন্ধকার নামে। দেখা যাচ্ছে দীঘার আলো। কাছেই অত মানুষের মেলা। অথচ এখানে! পৃথিবীই নেই এমন মনে হয়। সাদা ঘোড়াটার রং সমুদ্র থেকে লায়কানখাসে গিয়ে আস্তে আস্তে উবে গেছে ঠিক। বাতাসে সাদা বাদামি সব রং উবে গিয়ে যেমন হয়েছে ঠিক তেমন দেখেছে কুন্তি। শ্রীপতির বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয় ভয় করে। হাওয়া শুধু হাওয়া। শ্রীপতি বিড়বিড় করতে থাকে, না, না।

দুই

সমুদ্র এদের বাঁচায়। সমুদ্র না থাকলে অনন্ত সার মরে যেত। লবণ ছাড়া আছে কী! সমুদ্রের জল শীতের সময় লবণে ভারী হয়। বড় বড় জোয়ারে জল চলে আসে লায়কানখাস অবধি। বড় জোয়ার মানে পূর্ণিমা অমাবস্যায়। সেই জল ধরে রাখা হয় মস্ত মস্ত গর্তে। জোয়ার সরে গেলে গর্তগুলো নোনাজলে ভর্তি হয়ে যায়। আর মাটিতেও মিশে যায় নুন। তারপর সেই জল রোদ্দুরে ঘন করে, পরিশ্রুত করে ঢেলে দেয়া হয় বড় বড় পলিথিনের সিটের ওপর। জল শুকিয়ে শুকিয়ে নুন ফুটে ওঠে। অনন্ত সারের বাপ ঠাকুরদা নুন মারত জমি চষত। এখন জমি নেই, নুন বেঁচে আছে।

আচমকা মেঘ এসেছে খুব ঘন করে। বছরের মতো নুনমারা শেষ। শ্রীপতি লায়কানখাস থেকে চলে আসার সময় অনন্ত বলেছে, বাবু কাজকর্ম হবে?

লোক তো রয়েছে আমার।

তবু।

ট্যুরিস্ট ধরে আনিস বখশিশ পাবি।

যতদিন মেঘ থাকবে আকাশে ততদিন কষ্ট। মেঘ কেটে গিয়ে কবে মৌসীর মাস—অঘ্রান আসবে, এখন সেই অপেক্ষায় আছে অনন্ত। অলঙ্কারপুরের লবণমারাদের কারও কারও জমি আছে, লবণটা অতিরিক্ত আয়। অনন্ত সারের অতিরিক্ত আয় নেই।

লবণ মানে শ্রম। সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়ে সমুদ্রের লবণ বার করে আনা, সেই লবণের সঙ্গে নিজের দেহের লবণও মিশিয়ে দিতে হবে। কথায় বলে, নুন না দিলি নুন পাবিনি।

নুন দেয়া মানে শ্রম দেয়া। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে বিন্দু বিন্দু ধবধবে স্ফটিকের সন্ধান করা।

একদিন এদেশে লবণ নিয়ে বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে এ তল্লাটের মানুষ সামিল হয়েছিল। তখন অনন্তর জন্ম হয়নি। লোকের কাছ শুনেছে সব।

লায়কানি বা নায়কানি অর্থে নৌকালি। নৌকালি সমুদ্রে থাকেন। সমুদ্র পাহারা দেন নৌকোয়। লায়কানি বুড়ির চেহারা যে দেখেছে সে ভোলেনি। রূপ কী! দেবীকে পুজো করে সমুদ্রে নেমে যাও, ভয় নেই। আর যদি দেবী অসন্তুষ্ট হন? একেবারে নৌকো সমেত মানুষকে বাতাস করে দেবেন। হাড়গোড় মাংস সমেত মানুষটা বাতাসে মিশে যাবে। সেই বাতাস হু-হু করে দৌড়ে আসবে সমুদ্দুর থেকে মাটির দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে বারবার।

এই সব কথা নুনমারাদের জানা। লায়কানি এসেছিল জাহাজে চেপে। সাত ভউনি সাত জাহাজে চেপে সমুদ্দুরে সাত জায়গায় নামল। সেই সাত ভউনির একজন এই বন লায়কান। ঐ চরভূমিতে তাঁর কত কালের জীর্ণ মন্দির। আগের কালে লায়কানির সিংহ ঝিঁঝির দিয়ে বাঁধা থাকত ঘনজঙ্গলের ভিতর এক আজানগাছে। এসব শোনা কথা, অনন্ত সার জানে, সক্কলে জানে। আজানগাছ দেখা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

রাতে লায়কানির চোখে আলো জ্বলে। তিনি সমুদ্রের পথে হেঁটে যান মস্ত এলোচুল নিয়ে। সেই ১৩৪৯-এর ঝড়ের আগে জঙ্গলে শুধু একটা মন্দিরই ছিল। আকাশছোঁয়া ঝাউয়ের ভিতরে আলো ঢুকতে পারত না। জঙ্গলের শৃঙ্খলে আঁটা সিংহটা মাঝেমধ্যে গর্জন করে উঠত বোধহয়। সিংহকে কেউ দেখেনি, গর্জন শুনেছে।

তখন এই এলাকা জুড়ে নুনমারাদের ওপর পড়ে গেছে সায়েবদের নিষেধাজ্ঞা। হীরাপুরে ছিল মিলিটারি ঘাঁটি। তারা গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালাতে জ্বালাতে চলে যাচ্ছে

রাণীসাই, চন্দরপুর থেকে মীরগোদা অবধি। দিশি নুন থাকলেই পুলিশের লাঠি গুলি, ঘরে ঘরে আগুন। দুই পুলিশ, দুফা আর গুঁফার কথা এখনও কেউ না কেউ বলে। বলবে আরও বহুদিন।

লায়কানির কাহিনির মতোই এ কাহিনিও লোকমুখে ঘোরে। দেবী মাহাত্ম্য আর মানুষের যুদ্ধ এক হয়ে যায়। নুনমারাদের খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ তখন গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালাচ্ছে, সেই সময় লায়কান বুড়ি জঙ্গলে হেঁটে গিয়ে সেই সিংহের শিকল খুলে দিলেন। সমুদ্র ফুঁসে উঠল।

লায়কানখাসে তখন বড় বড় ঝাউ তেঁতুল। সেই সব গাছের কোনো একটায় এসে দেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। গাছ ফুঁড়ে বেরিয়ে সিংহের শিকল খুলে দেবী পানসি নিয়ে সমুদ্রে নামলেন। এলোচুলে পানসির ওপর বসে আছেন লায়কানি। ক্রমাগত চুল আঁচড়ে যাচ্ছেন তিনি। চুলের ভিতর দিয়ে মেঘ বেরিয়ে বেরিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঘোর বিপর্যয় শুরু হলো।

দুর্দম ঢেউয়ে ঢেউয়ে সিপাই সান্ত্রী সব উধাও। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব। সমুদ্র ভেড়িবাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ল পুলিশ মিলিটারি ব্যারাকে। সায়েবদের হাত থেকে নুনমারারা বাঁচল।

জন্ম হলো লায়কানখাসের। আকাশছোঁয়া বৃক্ষেরা সব মাটিতে শুয়ে পড়ল। খা খা করতে লাগল সব। দূরে সমুদ্র নীল। আস্তে আস্তে বালি গরম হয়। গাছগাছালি পরিষ্কার হয়। লায়কানখাস মরুভূমি হয়ে গেল। নুনমারাদের ডাকলেন দেবী।

সিপাই সান্ত্রীরা গেল কোথায়? না হাওয়া হয়ে গেল। লায়কানি হাওয়া করে দিলেন সব্বাইকে। তারা বর্ণহীন হয়ে বাতাসে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ল ঝাউয়ের মাথায় মাথায়। একবার দক্ষিণ থেকে তারা উত্তরে যায়, আর উত্তর থেকে হাওয়া আসে দক্ষিণে। লায়কানি হাওয়াদের পাঠান তাঁর আর সব বোনেদের কাছে। ঐ ওড়িশার ফুলবনি খাসে আছেন ফুলেশ্বরী, উত্তরে পানিপারুল বারঙ্গতে আছেন লঙ্কেশ্বরী...এই রকম সবাই হাওয়াদের নিয়ে খেলা করেন। সিপাই সান্ত্রীদের নিয়ে খেলা করেন।

অনন্ত সার ফিরতে ফিরতে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, মনে নাই বন্ন?

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাতে থাকে, উ হুঁ।

বন্ন দেখিস নাই তো কী দেখলি? অনন্ত জিজ্ঞেস করে।

অশ্ব!

অশ্ব! বন্ন নাই! মানে বাতাস!

অনন্ত সারের ভেতরটা কেমন ছমছম করে ওঠে। মানে লায়কানির অভিশাপ দেখল নাকি কচি মেয়েটা?

ফিরতে ফিরতে অনন্ত বলে, ছিপতিবাবুর অশ্ব চাপা কি আজকের! ওই একটা জন্তু বটে পিঠে চাপলেই রাজা। ওর বাপ চাপত, পিতাম' চাপত, তার বাপ চাপত, নায়েবের বংশ কিনা।